দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ..25 OCT 2016..
পৃষ্ঠা ...৪... কলাম ...৫...

ইকবাল খন্দকার

সৃজনশীল প্রশ্নের সৃজনশীলতা নিয়ে প্রশ্ন

বছরদশেক আগের ঘটনা। ফান ম্যাগাজিনের সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে এক পত্রিকা অফিসে গেছি। দেখা হলো, কুশল বিনিময় হলো। চা খেতে খেতে সম্পাদক বললেন– মজার একটা চিঠি আছে। এক পাঠক পাঠিয়েছে। চাইলে পড়ে দেখতে পারেন। আমি চিঠিটা পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করতেই সম্পাদক সেটি আমার হাতে দিলেন। খুললাম। দেখি তেলাপোকার গায়ে কালি মেখে ছেড়ে দিলে সাদা কাগজের ওপর যে ধরনের দাগ তৈরি হওয়ার কথা, সে ধরনের লেখা পাতাজুড়ে। আমি বেশ ধৈর্যসহকারে লেখাগুলো পড়লাম এবং মূল বক্তব্য অনুধাবন করতে সক্ষম হলাম। মূল বক্তব্য হচ্ছে– অনেক চেষ্টা-তদবির করেও ভদ্রলোক বিয়ে করতে পারছেন না। কোনো না কোনো কারণে বিয়ে ভেঙে যাচ্ছে। সবশেষে এক জায়গায় বিয়ের কথা অনেকদূর এগোনোর পর একটা ঝামেলা দেখা দিয়েছে। ঝামেলাটা হচ্ছে, হবু কনে সাধারণ ছেলেকে বিয়ে করবে না। তার এমন ছেলে পছন্দ, যে সৃজনশীল কাজের সঙ্গে জড়িত। হতে পারে সেটা লেখালেখি, গান বা অন্যকিছু। মেয়েটাকে ভদ্রলোকের বিস্তর পছন্দ হয়েছে, তাই তিনি কোনোভাবেই তাকে ছাড়তে চাচ্ছেন না। কিন্তু তার মধ্যে কোনো সৃজনশীলতাও নেই যা দিয়ে তিনি হবু কনের 'কন্ডিশন' পূরণ করতে পারেন। তাই তিনি দ্বারস্থ হয়েছেন সম্পাদকের। যেহেতু সম্পাদকের কাছে অনেকের অনেক লেখাই আসে, তাই তিনি যেন কারো কোনো একটা লেখা এই ভদ্রলোকের নামে ছাপিয়ে দেন। যাতে ভদ্রলোক মেয়েটাকে পাতাটা দেখিয়ে বলতে পারেন, এই দেখো, আমার লেখা ছাপা হয়েছে। তার মানে আমি সৃজনশীল। হ্যাঁ, সৃজনশীলতার বিশেষ একটা কদর সব সময়ই ছিল, আছে। যে কারণে অবৈধ পথে সৃজনশীল সাজার চেষ্টা করতেও দেখা যায় অনেককে। কিন্তু আমাদের প্রশ্নপত্রে যে সৃজনশীলতা সংযুক্ত করা হয়েছে, এখানে কোনো অবৈধতা নেই। বরং আছে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের মেধাকে সম্প্রসারিত করার বৈধ এবং সময়োপযোগী প্রচেষ্টা। কিন্তু হতাশাজনক হলেও সত্য, যে সৃজনশীল প্রশ্নকে ঘিরে আমরা সৃজনশীল প্রজন্ম গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছি, সেই প্রশ্ন যারা তৈরি করেন, তাদের সৃজনশীলতা নিয়েই এখন প্রশ্ন উঠেছে। বলছি শিক্ষকদের কথা। সৃজনশীল প্রশ্ন পরীক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপনের আগে সেটি নিখুঁতভাবে তৈরি করা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের শিক্ষকরা তা করতে ব্যর্থ হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, এই কাজ করতে গিয়ে তারা অভিযুক্ত হচ্ছেন নানা অভিযোগে। এর মধ্যে দুটি অভিযোগ মারাত্মক। ১. তারা বাজারে প্রচলিত নোট-গাইড দেখে প্রশ্ন করছেন। ২. প্রশ্ন তৈরি করতে গিয়ে তারা ধরনা দিচ্ছেন অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে। প্রথম অভিযোগটি নিয়ে আগে কথা বলা যাক। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করার পেছনে প্রধান যে কারণটি ছিল সেটি হচ্ছে নোট-গাইড বইয়ের ওপর ছাত্রছাত্রীদের নির্ভরতা কমানো। কিছু প্রশ্নোত্তর মুখস্থ করবে, তার পর সেগুলো পরীক্ষার খাতায় লিখে দিয়ে চলে আসবে– এটা যাতে না হয়। যেন তারা নিজের মতো করে লিখতে পারে, নিজের ভেতরের সৃজনশীলতাকে ফুটিয়ে তুলতে পারে। তো যেখানে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির উদ্দেশ্যই নোট-গাইডের ওপর নির্ভরতা কমানো, সেখানে শিক্ষকরা যদি প্রশ্ন করতে গিয়ে সেই নোট-গাইডেরই আশ্রয় নেন, তাহলে এর চেয়ে ব্যর্থতা, এর চেয়ে লজ্জার আর কিছু হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে একটা গল্প মনে পড়ল। এক জুনিয়র সুরকার গেছে এক সিনিয়র সুরকারের কাছে। গিয়ে বলল– আমি সুর করতে বসলেই নকল সুর চলে আসে। কিন্তু আমি নকল সুর তৈরি করতে চাই না। আমি মৌলিক সুরকার হতে চাই। এর জন্য আমাকে কী করতে হবে, একটু পরামর্শ দিন প্লিজ। সিনিয়র সুরকার বলল– খুবই চমৎকার পরামর্শ চেয়েছ। তবে পরামর্শটা আমি এখন দিতে পারব না। তুমি দুই দিন পরে আসো। জুনিয়র সুরকার আমতা আমতা করে বলল– কেন, কোনো সমস্যা? সিনিয়র সুরকার বলল– না, তেমন কোনো সমস্যা নয়। আসলে মৌলিক সুরকার হতে হলে কী করতে হবে, এটা আমি নিজেও জানি না। তাই পাঁচ-দশজনের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। একটু সময় তো লাগবেই, তাই না? আর কারো কাছ থেকে যদি জানতে না পারি, তাহলে নেটে সার্চ দিয়ে জানার চেষ্টা করব। এখানেও একটু সময় লাগবে। কারণ নেট যা স্লো! গল্পটি প্রথম অভিযোগের প্রসঙ্গে চলে এলেও এখানে কিন্তু দ্বিতীয় অভিযোগের বিষয়টিও চলে এসেছে। শিক্ষকরা নাকি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরি করতে গিয়ে অন্য শিক্ষকদের কাছে ধরনা দেন। মানা যায়? পরীক্ষার হলে এক ছাত্র আরেক ছাত্রের খাতা দেখে লিখলে সেটা যেমন অপরাধ, সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরি করতে গিয়ে কোনো শিক্ষক যদি আরেক শিক্ষকের কাছে ধরনা দেন, সেটাও একই রকম অপরাধ। কারণ এখানে মৌলিকত্ব এবং সৃজনশীলতা বলতে কিছু থাকে না। আর সৃজনশীল প্রশ্নে যদি এই দুটি জিনিস না থাকে, তাহলে এর চেয়ে অনেক ভালো গৎবাঁধা প্রশ্ন মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে দিয়ে চলে আসা। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) এ সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ১৮ দশমিক ৪৪ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষক এখনো নোট- গাইড থেকে প্রশ্ন সংগ্রহ করেন। ২৬ দশমিক ৯০ শতাংশ শিক্ষক অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সহযোগিতা নেন। গড় হিসাবে ৪৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষকই এখন পর্যন্ত সৃজনশীল প্রশ্নপত্র তৈরি করতে অপারগ। আর এই লজ্জা নিয়েই এগিয়ে চলেছে আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। কিন্তু কেন? শিক্ষাবিদদের অভিমত, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে শিক্ষকদের এই দৈন্যদশা। শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ পান মাত্র তিন দিনের। অথচ পুরো বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে প্রশিক্ষণ দরকার তিন মাসের। কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো উদ্যোগ নেই। আবার যে পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণটা দেওয়া হচ্ছে, সেখানেও রয়েছে ত্রুটি। যার কারণে শিক্ষকরা ষোল আনা উপকার পাচ্ছেন না। আবার সব শিক্ষক যে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন, তাও নয়। মাউশির তথ্য অনুযায়ী যেসব স্কুলকে মনিটরিংয়ের আওতায় আনা হয়েছে, সেসব স্কুলে শিক্ষক ছিলেন ৯৮ হাজার ৯৬৯ জন। এর মধ্যে সৃজনশীল বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ৫৩ হাজার ৮২৯ জন। বাকি ৪৫ হাজার ১৪০ জন প্রশিক্ষণই পাননি। এ ধরনের নানা সমস্যায় জর্জরিত যে ক্ষেত্রটি, সেখান থেকে কীভাবে সৃজনশীলতা আশা করা যায়? আমরা যদি প্রাপ্তির আশা করি, তাহলে অবশ্যই সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধান করতে হবে। শিক্ষকদের দিয়ে ভোটার তালিকা করানো হয়। কেন? ভোটার তালিকা কোন সূত্রে শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত? শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হচ্ছে প্রশ্নপত্র। তারা কীভাবে এই প্রশ্নপত্র সঠিকভাবে প্রণয়ন করতে পারবেন, সেই উদ্যোগ নেওয়া উচিত। সৃজনশীল পদ্ধতির মতো নতুন একটা পদ্ধতি শিক্ষকরা তিন দিনের প্রশিক্ষণে শিখে ফেলবেন, এই আশা কীভাবে করা হয়? একজন শিক্ষককে যদি দীর্ঘসময় নিয়ে ভালোভাবে প্রশিক্ষিত করে তোলা যায়, তাহলে সেটা পুরো শিক্ষাব্যবস্থার জন্য কল্যাণকর। একজন পরিপূর্ণভাবে প্রশিক্ষণ দেয়ালে তিনি তো সেটা ভুলে যাবেন না। বরং যত কাজে লাগাবেন, ততই তিনি দক্ষ হয়ে উঠবেন, ভালো কাজ উপহার দেবেন। তাহলে কেন এই কৃপণতা? ভোটার তালিকা থেকে শুরু করে আরো যেসব কাজ শিক্ষকদের সঙ্গে যায় না, সেগুলো থেকে তাদের বিরত রাখা হোক। তারা যেন পুরো মনোযোগটা কেবল জ্ঞান বিতরণের প্রতি দিতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হোক। এটা অনেক পুরনো এবং বহুল প্রচলিত কথা যে, শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কথা যত পুরনোই হোক, সেটা মিথ্যা তো নয়। সত্যিই তো আমাদের সবকিছু এই এক শিক্ষার ওপর ভিত্তি করেই টিকে আছে। তাহলে যে সমস্যাগুলো দৃশ্যমান, যে সমস্যাগুলো খুব সহজে সমাধান করে ফেলাও সম্ভব, সেগুলোকে কেন জিইয়ে রাখা হবে? কখনো ছাত্রছাত্রীদের ওপর দোষ চাপিয়ে, কখনো শিক্ষকদের ওপর দোষ চাপিয়ে কেন পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হবে? পাশ কাটিয়ে গেলেই বা আর কদিন যাওয়া যাবে? একদিন না একদিন তো বিপদের সম্মুখীন হতেই হবে। যে রোগ নিরাময় যোগ্য, সে রোগকে সময়মতো না সারিয়ে কেন সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে? আমাদের কথা একটাই, আমরা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে ত্রুটিমুক্ত দেখতে চাই, শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতি দেখতে চাই। আর এই মুহূর্তে যেটি চাই সেটি হচ্ছে– সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে যেন আর কোনো প্রশ্ন না ওঠে।

লেখক : কথাসাহিত্যিক ও টিভি উপস্থাপক
iqbalkhondokar@yahoo.com